প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

কোন অঞ্চলের সাহিত্য সঙ্গীত সেই সমাজ বা অঞ্চলের দর্পণ। বিশেষ করে সঙ্গীতেই আমরা সমাজ জীবনের পুরো ছায়া দেখতে পাই। সেদিক থেকে লোকসাহিত্য বা লোকগীতি কোন অঞ্চলের নিজস্ব সম্পদ। বিচিত্র পরিবেশের খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের গলা দিয়ে স্বতস্ফূর্তভাবে এ গান বেরিয়ে আসে। একে উচ্চতর সাহিত্যের সঙ্গে কোন অংশেই তুলনা করা চলে না। গ্রাম বাংলার মানুষ কাজের অবসরে গ্রাম্যীণ বাদ্যযন্ত্র সহকারে গান বাঁধে এবং ওদের করুণ ও আনন্দময় জীবনগাঁথাকে তুলে ধরে সুরের মাধ্যমে। সেখানে যেন সোঁদা-মাটির গন্ধ পাওয়া যায়। দক্ষ গায়ক কখনও সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে আনন্দের গান গেয়ে ওঠে। আবার কখনও খরা ও বন্যায় দুঃখের গান বাঁধে। বঞ্চনা ও বিরহের গানও শোনা যায়। এ গানের স্রষ্টাও মাটির মানুষ, কখনও অর্ধভুক্ত মানুষের গলায় সে গান সোচ্চার হয়ে ওঠে। নিত্যদিনের সঙ্গী অভাব দারিদ্র্যকে সঙ্গে নিয়েই গায়ন গান করে। তবে লোকগীতিকে আদিম বলা যাবে না যদিও এ গানের রচয়িতা ও গায়ক অশিক্ষিত সমাজ।

বাঙালীর বারমাসের তের পার্বনের গানও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সুরে শোনা যায়। বিশেষ করে পল্লী কবিদের স্বভাব ও গান বাঁধার ধরণ একই ধরনের। কোন উঁচুদরের কবি সাহিত্যিক বা গায়কের সঙ্গে এর তুলনা চলে না, তবে এ সঙ্গীত অবহেলার নয়। এ যেন একটা অন্য সুর, অন্য ঢঙে, অন্য লয়ে তৈরি। পল্লী কবি বা গায়কের মূল্যও কম নয়। বাংলার সমাজজীবনে মাটির ধুলায় লুটানো লুকিয়ে থাকা গানকে গায়ন তুলে ধরে। ভূপ্রকৃতি ও ভৌগোলিক পরিমন্ডলের মধ্যে ব্যবধান ও ভাষাগত ব্যবধান থাকার জন্য পল্লীগীতিগুলিকে খানিকটা পৃথক করা যায়। কিন্তু সকলেরই মনের কথা এক, এক তন্ত্রীতে বাঁধা। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য তাঁর বাংলা লোক সাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন -

"লোক সংগীতের আলোচনায় যতই অগ্রসর হব, ততই দেখতে পাব যে, এর সৃষ্টি অশিক্ষিত মস্তিষ্কের খামখেয়ালীতে নয় এর মধ্যেও রয়েছে সমস্ত সার্থক শিল্পসম্মত নীতি, নিয়ম ও শৃঙ্খলা, যুক্তি দিয়ে যার বিচার চলে, গ্রাম্য গায়ক জেনে হোক না জেনে হোক অত্যন্ত কঠোর ভাবেই তা পালন করে থাকে।" [১]

একথা সত্য যে কোন অঞ্চলের পল্লীগীতি শোনামাত্র মানুষ বুঝতে পারে এ পল্লীগীতিই। সম্প্রতি আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও পল্লীসুরেও কোন বিকৃতি ঘটেনি। আধুনিক শিক্ষিত গায়ন গানে যোগ দিয়েছে আধুনিক যন্ত্র তথাপি পল্লীসুরে কোন বিকৃতি লক্ষ্য করা যায় না।

লোকসঙ্গীতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ইহা গুরুমুখী নয় গণমুখী। লোকসঙ্গীতের 'ঘরানা' নেই আছে 'বহিরানা'। গান রচনা করে একজন তারপর সে গান ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে। সে গান হয়ে যায় সমষ্টির গান। পল্লী অঞ্চলে সকলে পালা করে গান করে। ব্যষ্টি অবলুপ্ত হয়ে সমষ্টিরই গান হয়ে যায়।

লোকগীতির মধ্য দিয়েই পল্লী অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। গায়ক মুখে মুখে গান রচনা করে। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন পল্লীসুর দেখা যায়। সবেতেই একটা স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়। এই স্বাতন্ত্র্য ছাড়াও লোকসঙ্গীতগুলিতে নারী-জীবনের এক বিশেষ দিক রয়েছে। বর্তমান গবেষণার আলোচ্য বিষয় "উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকগীতি ও নারীজীবন"।

ভৌগোলিক দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরখণ্ডের যেমন বিশিষ্টতা বিদ্যমান, সাংস্কৃতিক দিক থেকেও তেমনি। এই সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতার অন্যতম দৃষ্টান্ত এই অঞ্চলের লোকগীতি।

বস্তুত: পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্রও যেমন, উত্তরবঙ্গেও তেমনি লোকগীতির মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনধারার পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলা যেমন - কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি, অখণ্ডিত দিনাজপুর ইত্যাদি অঞ্চলের মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে একটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। উত্তরবাংলার এই কয়টি অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান রাজবংশী মানুষের বাস। তাছাড়াও কোচ, মেচ, গাড়ো, দোভাষীয়া, মোড়ঙ্গিয়া জাতির মানুষও বাস করে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থেরও বসতি রয়েছে। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার ম্যাপ দেওয়া হল। ম্যাপে নির্দেশিত জায়গাগুলিতে রাজবংশী মানুষ বাস করে থাকে। (পার্শ্বস্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকা গ্রন্থে ১৯৫১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের জাতিগত জনসংখ্যার পরিমাণ দেখিয়েছেন। নিম্নে তারই নমুনা দেওয়া হল।[২]

জেলা	রাজবংশী	কোচ	পলিয়া	তিয়র
দার্জিলিং	১৫, ৮৯৪	-	১	-
জলপাইগুড়ি	১৭২, ৭১০	১৯৪	-	৩
কোচবিহার	২৫২, ০৬৯	৯	-	৬
দিনাজপুর	৬৭,৪৮৯	৩৩১	১০, ০৪৪	১৪২১

১৯৫১ - ১৯৭১ সালের প্রতি ১০ বছরে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা-বৃদ্ধির আনুপাতিক হিসেব দেওয়া হল।

জেলা	বছর	অন্যান্য জনগোষ্ঠী	রাজবংশী জনগোষ্ঠী	তপশিলী উপজাতির জনগোষ্ঠী
দার্জিলিং	১৯৫১	৩১১.৭১	১৮.০১	১১৪.১৩
	১৯৬১	৩১.১৫	০.১০	১২.৫৮
	১৯৭১	৫৫৫.৫২	১৮.২১	১৪৬.৫০
জলপাইগুড়ি	১৯৫১	৬৪.২৩	৮২.১৭	৮৭.৫০
	১৯৬১	১৫১.৩১	৪.১৬	২০.৮১
	১৯৭১	৩২৬.০২	১০.৬০	১২৬.৫৩
কোচবিহার	১৯৫১	২৪২.৭৪	৬৫.৫১	২৩৪.৫৬
	১৯৬১	২০৮.১৪	১৪.১৫	৩০.০৭
	১৯৭১	১৫৬.১৪	১০.১৪	৭৮.২০
পশ্চিম দিনাজপুর	১৯৫১	২৪৭.০৮	৩৮.৩৪	২৭.০০
	১৯৬১	৫২.৫৭	৪৪.৫৫	৩০.০৭
	১৯৭১	৪২১.৫৮	১১.১১	৭৮.২০
মালদহ	১৯৫১	৭.৬৭	৮১.৪৩	২৩.৬৮
	১৯৬১	৬১.১১	৩১.৮৬	৩১.৩৪
	১৯৭১	৮৫.২১	১৪১.৭১	৬২.৪৮
উত্তরবঙ্গ	১৯৫১	১০২.১২	৫১.১২	৬৫.৬৩
	১৯৬১	১৩.১১	১৪.৪৩	২৩.৩২
	১৯৭১	২৭১.৩১	১৪.৪৬	১০৪.২৫

বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে ১৯৭১ সালের আদমসুমারীতে রাজবংশীদের স্বতন্ত্র আদিবাসী হিসাবে না দেখিয়ে তাদের মূল জনসংখ্যার মধ্যে দেখিয়েছেন। সে পরিসংখ্যানও নীচে দেওয়া হল :

জেলা	মোট জনসংখ্যা	মোট আদিবাসীর সংখ্যা
দার্জিলিং	৭, ৮১, ৭৭৭	১, ০৮, ৫৮৬
জলপাইগুড়ি	১৭, ৫০, ১৪৯	৪, ২৮, ৫৯৫
কোচবিহার	১৪, ১৪, ১৮৩	১০, ৬১১
পশ্চিম দিনাজপুর	১৮, ৫৯, ৮৮৭	২, ২১, ৩১৭

উত্তরবাংলার এই বিপুল সংখ্যক রাজবংশী মানুষ সাধারণতঃ উপভাষাতেই কথা বলে। কিন্তু এর অনেক শব্দ আছে যা সংস্কৃত ও পারসীমূলক। মেচ ও কাছারী শব্দও অনেক পাওয়া যায়।

স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রিয়ারসন তাঁর "লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া" গ্রন্থে উত্তরবঙ্গের এই ভাষাকে রাজবংশী ভাষা নামে অভিহিত করেছেন। পূর্বখন্ডের বাংলা ভাষার তিনটি বিভাগ করেছেন। যথা -

ভাষা পরিচয়	ভাষা-ভাষীর সংখ্যা
স্ট্যান্ডার্ড বা সাধারণ	১৬৯১০৬৫১
রাজবংশী	৩৫০১১৭১
দক্ষিণ-পূর্ব	২৩১০৭৮৪
মোট	২২৭৩০৬০৬

এই অঞ্চলের ভাষা, লোকগীতি, আচার-ব্যবহার, দৈনন্দিন জীবনের কর্মধারার আশা আকাঙ্ক্ষা ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে রাজবংশী মানুষের পূর্ণ সংস্কৃতির ছবি পাওয়া যায়। সামগ্রিক ভাবে দেখলে এইসব টুকরো টুকরো ছবির সমবায়ে এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের একটি অন্তরঙ্গ আলেখ্য এর ভেতর দিয়ে গড়ে তোলা সম্ভব। বলা বাহুল্য সেই কারণেই, বিশেষভাবে যদি সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যায়, এই অঞ্চলের লোকগীতির মূল্য অপরিসীম। বস্তুতঃ লোকগীতি হল কোন অঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতি এবং কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন,

> "লোকসাহিত্য ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমবেত সৃষ্টি। ব্যষ্টির মনে যে ভাবের উদয় হয় তাহার অসম্পূর্ণ রূপায়ণকেই সমষ্টি নিজের আদর্শে সম্পূর্ণ করিয়া লয়।" [৬]

অন্যান্য অঞ্চলের লোকগীতির মতই উত্তরবঙ্গের লোকগীতিতেও সেই অঞ্চলের মানুষের দুঃখ, বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা সুখ দুখ দুঃখ, অনুভূতি সবই অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীতে গায়কের গলায় সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীয় লোকগীতিতে নারীর একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শ্রী নির্মলচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর বঙ্গ রমণীর বিস্মৃত ইতিহাস গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন -

> "উত্তরবঙ্গের এই কোচ রাজবংশী সমাজে রমণীগণ আত্ম-প্রতিষ্ঠার কারণে ভবিষ্যৎ সংগ্রাম করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে" [৭]

> "নাটাইক করিম ধনু ঢাকুয়াক করিম শর
> যত রঁব রথও চরি বাম কেরুয়াক করিম ভর॥
> প্রাণর বৈরিক আনিস যান পাশত বান্ধিয়া
> সোয়ামী পুত্র যরিল রণত মুই রম কিসের লাগিয়া॥

বেশিরভাগ গানই নারীর বিরহ বেদনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ইত্যাদির গান। এই গানগুলি বিশ্লেষণ করলেই রাজবংশী রমণীদের একটা বিশেষ রূপ ধরা পড়ে। নারীরা একাধারে জননী, প্রেমিকা, আবার প্রেরণাদাত্রী। পুরুষের জীবন একজন রমণী ছাড়া ব্যর্থ। নারীর প্রেরণাতেই তারা কাজে উৎসাহ পায়।

রাজবংশী রমণীর প্রকৃত সত্তা বিশ্লেষণ করার আগে আমাদের জানা দরকার - রাজবংশী কারা ? এ ব্যাপারে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন কথা বলে থাকেন। কিছু লেখক যেমন - ডালটন, রেইসলে, গয়েট এবং হ্যামিলটন তারা বলেন রাজবংশীরা একটা আদিবাসী জনগোষ্ঠী। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে - রাজবংশীরা কোচ জাতি থেকে পরিবর্তিত হয়েছে। যা হোক সমস্ত উত্তরবঙ্গ জুড়ে রাজবংশীয় জনগোষ্ঠী বসবাস করে আসছে স্থায়ীভাবে। তাঁদের আচার আচরণ, খাওয়া দাওয়া, চলাফেরা প্রায় সমগ্র অঞ্চলেই এক। ভাষাগত খানিকটা হেরফের থাকতে পারে। তথাপি এক অঞ্চলের জনসমাজকে দেখলে অন্য অঞ্চলের মানুষের বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। সকলেই একই মায়ের সন্তান বললে অত্যুক্তি হবে না। ১৯৭১ সালের রাজবংশী মানুষের লোকসংখ্যা গণনার পরিমাপ নিম্নে দেওয়া হল।[৮]

প্রশাসনিক বিভাগ	মোট রাজবংশী জনসংখ্যা	শতকরা হিসাব
জলপাইগুড়ি	১০, ২৭, ৬৬১	৭৫.১০
প্রেসিডেন্সী	২, ২৬, ২৫০	১৬.৭২
বর্ধমান	১, ০০, ০০০	৭.৩৮
পশ্চিমবাংলা	১৩, ৫৩, ১১১	১০০.০০

রাজবংশীরা মূলতঃ কৃষিজীবি। সম্প্রতি শিক্ষার প্রসারে এবং নানা সামাজিক চাপে মানুষের মধ্যে চাকুরীর মানসিকতা ঢুকেছে। কিছু মানুষ শহরমুখী হয়েছেন। তথাপি রাজবংশীয় বেশির ভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভর করে বেঁচে আছেন। এঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁদের চাওয়া পাওয়াও খুবই সীমিত। দুবেলা দুমুঠো ভাতের বাইরে এদের আর যেন কোন চাওয়া পাওয়া নেই। রাজবংশী লোকগীতিতে এর সুস্পষ্ট প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়।

কৃষির উপর নির্ভর করলেও রাজবংশীয় পুরুষরা মাছও ধরে। এটা ওদের শখের মধ্যেও গন্য করা যায়। সম্প্রতি জমির মালিকানা অনেকাংশে অন্যদের হাতে চলে যায়। তাই রাজবংশী কিছু মানুষ শহরমুখী হয়েছে। শহরে এসে ছোটখাট ব্যবসা, রাজমিস্ত্রী, ছুতোর এবং রিকশা চালিয়ে ওরা জীবনধারণ করে থাকে।

রাজবংশী রমণীরা খুবই পরিশ্রমী। পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে ওরা তাল মিলিয়ে পরিশ্রম করে। একটা পরিবারের উন্নতির পেছনে পুরুষের মত রমণীর ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সংসারের সমস্ত কাজ মেয়েরাই করে। সাধারণ ঘরের রমণীরা মাঠেও কাজ করে। উত্তরবঙ্গের রমণীদের রাজপুত রমণীদের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। রাজবংশী সমাজ যে কৃষি নির্ভর তার সুস্পষ্ট ছবি পাই রাজবংশী লোকগীতিতে। বিভিন্ন ধরণের গান যেমন ফসল-কাটার গান, নতুন-ধানের গান, বৃষ্টি-কামনায় গান ইত্যাদিতে প্রমাণ পাওয়া যায় রাজবংশী সমাজ কৃষি নির্ভর। চারুচন্দ্র সান্যাল, তাঁর 'The Rajbansis of North Bengal' গ্রন্থে বলেছেন -

> "The lands of North Bengal were not densely populated - when a king or a chief occupied the lands his soldiers or his retenue took possession of as much

land as they could grab. They brought labourers, cleared the forest and started cultivation. These people became jotedar's or landlords. [৯]

রাজবংশীয়রা শিক্ষার দিক থেকেও অনগ্রসর। সম্প্রতি শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে মানুষের শিক্ষার দিকে ঝোঁক দেখা গেছে। গ্রামে গ্রামে রাজবংশীয় ছেলে মেয়েরা লেখাপড়ায় মন দিয়েছে। শ্রী রজতশুভ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর 'দি রাজবনসীস অব নর্থবেঙ্গল' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন -

"Among all the four social groups the overall literacy of the females was much lower than the males. According to the 1971 census the rate of literacy among the female of the Rajbansis was 7.68% as compared to 17.22% in the case of the non scheduled population." [১০]

তিনি তাঁর গ্রন্থে ১৯৬১ ও ১৯৭১ সালের রাজবংশী মানুষের শিক্ষার হার দেখিয়েছেন।

জেলা	বছর	পুরুষ	মেয়ে	সর্বমোট সংখ্যা
উত্তরবাংলা	১৯৬১	২৩.১২	৪.০১	১২.৮৩
	১৯৭১	২৩.৬২	৭.৬৮	১৫.৮৫

রজতশুভ্রবাবু তাঁর গ্রন্থে উত্তরবাংলার জেলা কয়টির বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর শিক্ষার তারতম্যের একটা সুন্দর পরিমাপ দিয়েছেন।[১১] তালিকাটি ১৯৬১-১৯৭১ সালের।

জেলা	অন্যান্য জনগোষ্ঠী	অন্যান্য তপশিলীভুক্ত জনগোষ্ঠী	রাজবংশী জনগোষ্ঠী	তপশিলী উপজাতি জনগোষ্ঠী
দার্জিলিং	৪৮.৭৭	৬৪.০০	১০.১৮	১৩.৫৮
জলপাইগুড়ি	৪২.২৮	৩১৭.৪৩	৭৬.৩২	৬৬.৩৫
কোচবিহার	৪৩.০৪	৩৫৪.৭৬	১১.০৭	৩.১৭
পশ্চিম দিনাজপুর	৭১.১৩	১৭৫.৫৫	৩৪.০২	১৭১.০০
মালদহ	৬১.৪২	৭২৭.৪৬	৫৩.২১	১৩৮.৩১
উত্তরবঙ্গ	৫৩.৮৩	১১৮.৬২	২৮.৪২	৭৪.৮৩

শিক্ষার দিক থেকে রাজবংশী মানুষ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় অনগ্রসর। শিক্ষার প্রতি ঝোঁক সাম্প্রতিক। আজ এক্ষেত্রে মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, চলাফেরা, কথা বলায় শহরের ছোঁয়া এসেছে। রমণীরা বিবাহের পাত্র হিসাবে শহরের চাকুরে ছেলেকেই কাম্য করে।

রাজবংশী মেয়েরা গহনা পরতে ভালবাসে। পূর্বে মেয়েরা রূপার গহনা পরত। সম্প্রতি শিক্ষিত মেয়েরা গহনাকে প্রায় বর্জন করেছে। তবু গ্রামাঞ্চলে রূপার গহনা পরার প্রচলন এখনও রয়েছে। রাজবংশী মেয়েদের গহনার একটা নমুনা দেওয়া হল।

ধর্মীয় দিক থেকেও রাজবংশীয়রা হিন্দু। নানাধরণের পূজা পার্বনের সঙ্গে জড়িত থাকে। এরা নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। এ ব্যাপারে নানা জনে নানা কথা বলেন। কেহ বা মনে করেন ইহারা দ্রাবিড়ভাষী কোন জাতির অর্ন্তভূক্ত ছিল এবং এঁরা বহুকাল ধরে উত্তরবঙ্গে বসবাস করে আসছে। এঁদের একটা নিজস্ব সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রয়েছে যা নিজ স্বাতন্ত্র্য ভাস্বর। এই অঞ্চলের লোকসাহিত্য যথা - ভাওয়াইয়া চটকা গান, জাগের গান, সারিগান, সত্যপীরের গান, ফসলকাটার গান, তিস্তাবুড়ি গান নানা ব্রতকথা ও পাঁচালী একান্তভাবে নিজস্ব এবং একটা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। রাজবংশীয়রা হিন্দু তাই হিন্দুধর্মের প্রভাব রয়েছে। তবু পূজা আর্চাতে পরিপূর্ণ আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া এতে নেই, তার পরিবর্তে আছে সম্পূর্ণ সোঁদামাটির গন্ধ। এই সমাজে নারীরা পুরুষশাসিত সমাজে থেকেও নানা আচার অনুষ্ঠানে নিজ স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া হল।

বর্তমান গবেষণার বিষয় রাজবংশী লোকগীতি ও নারীজীবন। রাজবংশী লোকগীতিতে একটি নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়। অন্যান্য লোকগীতিতেও সেটি রয়েছে। কিন্তু রাজবংশী লোকগীতিতে নারীর একটা বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বস্তুত সেই কারণেই রাজবংশী লোকগীতিতে নারীজীবনের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। এর ভেতর দিয়েই বিশিষ্ট নারীসমাজ তথা নারী জীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে এবং তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখদুঃখের কাহিনী সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে। লোকগীতিতে শুধু নারীজীবন নয় পুরো রাজবংশী সমাজের ছবি আমরা পাই। গায়নের বোলেই ধরা পড়ে সমাজের কৃষ্টি সংস্কৃতি, গতি ও প্রকৃতি। বিশেষ করে নারীর অন্তর বেদনার কথা, ভালবাসা, বিরহ, আশা আকাঙ্ক্ষা চাওয়া পাওয়া সবই প্রকাশ পেয়েছে গানে। গানগুলি যেন রচিত হয়েছে নারীকে সামনে রেখে।

লোকসাহিত্য, ব্রতকথা, গান সবকিছুই নারীকে ঘিরে। সে হিসেবে সবদেশের লোকসাহিত্য একই ধরনের। সবেতেই নারীর কামনা বাসনা এবং মনের অন্তরবেদনার কথা ব্যক্ত হয়েছে কিন্তু রাজবংশী লোকগীতিতে আমরা একটু পার্থক্য লক্ষ্য করি। অন্যান্য লোককথাতে নারীরা ভগবানের উদ্দেশ্যে তাদের কামনা বাসনা জানায় তাই সেখানে খানিকটা আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া পাই। কিন্তু রাজবংশী লোককথার ধরণে খানিকটা তফাৎ রয়েছে। এখানে দেবতাকে মাটির আসনে নামান হয়েছে অর্থাৎ দেবতা হয়েছেন মানুষ। অপার বিশেষত্ব হল গানগুলি নারীর জীবনকে কেন্দ্র করেই দানা বেঁধেছে। এদিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান গবেষণা প্রকল্পের অবতারণা করা হয়েছে। রাজবংশী লোকগীতির মধ্যে বিধৃত নারী-জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

রাজবংশী লোকগীতি জীবন থেকে উঠে আসা খাঁটি জীবনের জয়গান। এখানে আছে বেদনার্ত মানুষের জীবনগাঁথা। এর মধ্যে নেই ধর্মের কোন গন্ধ অথবা নগরজীবনের রঙিন্মা এবং আধুনিকতার আলো। ছায়াসুশীতল শ্যামলশোভন গ্রামের মনোমুখকর গাঁথা। গায়নের মুখ দিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উঠে এসেছে সে গান। অশ্রুসজল অশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ের কামনা বাসনা, প্রেম ভালবাসার অনবদ্য গাঁথা। যুগপরিবর্তনে সে গানের ভাষা এবং যন্ত্রের ব্যবহারেও খানিকটা পরিবর্তন এসেছে তবুও গানের সুরে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করা যায়।

অঞ্চলভেদে সুরে ও উচ্চারণে খানিকটা বৈষম্য পরিলক্ষিত হলেও রাজবংশী লোকসঙ্গীত নারীর গান। নারীকে নিয়ে এত গান কোথাও নেই। সংসারের নানা ভার বহন করেও এবং নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করেও নারী ভালবাসে। সেই ভালবাসার অনবদ্য রূপটি ধরা পড়েছে গানে। নারীর ভালবাসায় ভাল হয়েছে দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামী, ঘরছাড়া ঘরে ফিরেছে এবং ভবঘুরে সংসারী হয়েছে।

নারী কখনও ভালবাসায় বিভোর হয়ে ঘর ছেড়েছে। প্রেমপাগলিনী নারী খুঁজে ফিরেছে তার ভবঘুরে প্রেমিককে। নারীর আকাঙ্ক্ষার পুরুষ নাইয়া, মইষাল, গাড়িয়াল ও যাহুত। তাইতো রাজবংশী ভাওয়াইয়া গানে মইষাল, গাড়িয়াল, ও যাহুতবন্ধুর কথা খুব শোনা যায়। আর সে প্রাণপুরুষও ধূসর বর্ণের, পড়নে একচিলতে বসন, ঘাড়ে গামছা, বলিষ্ঠ গড়নের। এ ধরনের পুরুষকেই নারী ভালবেসে ধন্য হয়েছে। নারী চোখের জলে ভাসিয়ে দিয়েছে এই পুরুষকে ভালবেসেই।

সঙ্গীতেই বেজে ওঠে কোন সমাজের প্রকৃত কথা। রাজবংশী সমাজেও তার ব্যতিক্রম নেই। রাজবংশী লোকগীতির সুরে নারীর কথাই বেশি ধরা পড়েছে। গ্রাম্য অশিক্ষিত মহিলারাই নানা ব্রতকথা আচারে অনুষ্ঠানে গান বাঁধে সেগুলিই রাজবংশী লোকগীতি অথবা লোককথা। সেই লোকগীতিতে সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়েছে সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি।

বর্তমান গবেষণায় নারীর বিভিন্নরূপ দেখানোই উদ্দেশ্য যা কিনা সঙ্গীতেই ফুটে উঠেছে। লোকসঙ্গীতগুলি কবি বা গায়ন সৃষ্টি করেছে কিন্তু নারীসৃষ্ট সঙ্গীতেরও অভাব নেই। গানগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে নারীর আশা আকাঙ্ক্ষা, বারমাসের সুখদুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি। বিশেষতঃ ভাওয়াইয়াসঙ্গীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে। শুধুই কী নির্মল বিশুদ্ধ প্রেম তা নয় পরকীয়া প্রেম ও অবৈধ প্রেমেরও প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায় গানগুলিতে। যেখানে কোন নারী স্বামীর মৃত্যুতেও বিধবা হতে চায় না প্রেমিকের মৃত্যুতে প্রকৃত বিধবা হবে বলে ঘোষণা করে। নারী ঘর ছাড়ে প্রেমিকের উদ্দেশ্যে। যে প্রেমিকের কোন চালচুলো নেই। নানা ঝড়ঝঞ্ঝা অতিক্রম করে ভালবাসার পুরুষকে পেতে চায়।

লোকগীতি সমাজের দলিল, কিন্তু রাজবংশী লোকগীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই সঙ্গীত যেন রাজবংশী নারী সমাজের দলিল। ভালবাসার আর্তি, প্রেম প্রেম খেলা সবই গানে

ফুটে উঠেছে। এছাড়াও কোন গানে প্রকাশ পেয়েছে অবিবাহিতা নারীর খেদ। কল্পনীয় স্বামীর যে মূর্তি স্থাপন করেছে তাকে পাবার জন্য ব্যাকুল আর্তি গানে ফুটে উঠেছে। বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরা চায় স্বামী। সংসারেই সে সুখী হতে চায়।

রাজবংশী নারী শুধুই ভালবাসতে চায়। ওরা বহুবল্লভা নয়। একটি স্বামীকে নিয়েই সে সুখী হতে চায়। যৌবনে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে পেতে চায়। স্বামীকে ভালবেসে এবং তার সেবাতেই জীবন কাটাতে চায়। প্রেমের একটা স্বর্গীয় রূপ গানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর প্রাপ্ত উত্তরবঙ্গের লোকগীতি গ্রন্থে বলেছেন -

> "সঙ্কলিত প্রেমের গানগুলির মধ্যে পূর্ণমিলনের উদ্দামতা যেমন নাই, বিরহের তীব্র হাহাকারও তেমনি বিশেষ নাই, দু একটা ক্ষেত্র ছাড়া মিলনের জন্য আকাঙ্ক্ষাই শুধু প্রতিফলিত হইয়াছে।" [১২]

নারী শুধুই ভালবাসে না যৌবনের বাহার সাজসজ্জা সবই প্রেমিকের জন্য। প্রেমাস্পদকে সে বলে বিয়ের আয়োজন করতে কারণ তার যৌবনের বাহার দেখাবার মানুষ নেই প্রেমিককে সে বলে - ওকি বন্ধুরে বুক ভেজে মোর দুই নয়নের জলে।

রাজবংশী মেয়েরা সাজসজ্জা পছন্দ করে গানে তার পূর্ণ-প্রতিফলন দেখা যায়। মেয়েরা সুন্দর পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়, পাটভাঙ্গা কাপড় পরতে ভালবাসে। প্রেমিকের কাছে দাবি করে কানের ঝুমকা, নাকের নোলক।

বিবাহ একটা লৌকিক আচার। রাজবংশী সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠান একটা সুন্দর অনুষ্ঠান। গান এর মুখ্য অংগ। সঙ্গীতমুখর হয় বিবাহ অনুষ্ঠান। মেয়েরা গানে গানে ভরিয়ে তোলে বিবাহ বাসর। গায়ে হলুদ থেকে শুরু করে জল আনতে যাওয়া, বর এবং বরযাত্রীকে ব্যঙ্গ করা সবেতেই গান রয়েছে। গানগুলি যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা প্রচলিত গান কখনও বা তাৎক্ষনিক পরিবেশ বুঝে মেয়েরা গান বাঁধে। এতে মেয়েদের চমৎকার

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। যে মেয়েরা অশিক্ষিতা, পড়েনি কোন কাব্য বা দর্শন, তাদের কবিতা বা গান শুনে চমৎকৃত হতে হয়।

ব্রতকথা আর পূজা আর্চাতে মেয়েদেরই একচ্ছত্র আধিপত্য। সেখানে পুরুষের কোন স্থান নেই। ব্রতকথাগুলি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে ভাস্বর। ব্রতকথা এক বিশেষ ঢঙে এবং বিশেষ পরিবেশে গাওয়া হয়। নাচেরও অপূর্ব কৌশল। কাহিনীধর্মী ব্রতকথাগুলি যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। আর নারীরাই তা ধরে রেখেছে।

বারমাসের গানগুলিও অপূর্ব। সেখানে নারীর বারমাসের দুঃখ কষ্ট বর্ণিত হয়েছে।

রাজবংশী মেয়েলী গীতিগুলি লোকসঙ্গীতে একটা বিশেষ স্থান দখল করেছে। এছাড়া রয়েছে তিস্তাবুড়ি গান, মেছেনীখেলা গান যেগুলিতে নারীরা ফসল কামনায় গান বাঁধে। চোরচুন্নীর গানগুলি খুবই সুখকর। চোর ও চুন্নী সমাজের প্রতিনিধি। তারা সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাজের কদর্য রূপটা তুলে ধরে। মন্ত্রীদেরও এরা আঘাত হানে। চটকা গানগুলিও অন্যতম সমাজ দলিল। সমাজের নানা চিত্র এতে রূপায়িত হয়েছে। নারীর নানা সুখ দুঃখ ভালবাসা সুন্দর চিত্রিত হয়েছে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের মধ্যে মৈষালবন্ধুর গান খুবই প্রচলিত গান। রাজবংশী রমণীর প্রাণপুরুষ এই মৈষাল কখনও বা গাড়িয়াল মাহুত অথবা ভিনদেশী কোন নৌকার নাবিক। পরিচ্ছন্ন পোশাকের কোন পুরুষকে নিতান্ত অবহেলায় দূরে ঠেলে দেয় এবং মইষালের মধ্যেই খুঁজে পায় পুরুষত্ব। কেন এই চাওয়া তা প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা হয়েছে।

নারীজীবনের বিশিষ্টতা, স্বাতন্ত্র্য ও যথার্থতার পরিচয় দেওয়াই আমার গবেষণার লক্ষ্য এবং প্রতিপাদ্য। আমার এই বক্তব্যকে তুলে ধরার জন্য আমি আমার আলোচনাকে

111477
2 8 SEP 1994
NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY RAJA RAMMOHUNPUR

কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি। আলোচ্য গবেষণায় বিভিন্ন অধ্যায়ে নারীর এই বিভিন্ন রূপ ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ভূমিকার পর দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রাজবংশী লোকগীতির পটভূমি এবং এই সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবরণ। রাজবংশী কারা এবং কোথায় কোথায় রাজবংশীরা বসবাস করে আসছে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলা যথা - কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম-দিনাজপুর, দার্জিলিং ও মালদহ জেলার রাজবংশী-দের কথাই মূলতঃ বলা হয়েছে। এদের জীবনযাত্রা বিবাহ, রীতিনীতি এবং বিভিন্ন সময়ে জেলাগুলির সেন্সাস রিপোর্ট তথা জনসংখ্যা ও শতকরা শিক্ষার হার আলোচনা করে বিষয়টির গুরুত্ব নির্দেশিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়েছে রাজবংশীয়রা কোন জনগোষ্ঠীর থেকে উদ্ভূত এবং কোচ, টোটো, ভুটিয়া ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর আলোচনা করা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের সাহিত্যচর্চা ও শিল্পচর্চা ছিল। বিশেষত রাজপরিবারের মেয়েরা অনেকে সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। রাজাদের নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল। কোচবিহার রাজার গ্রন্থাগারে কিছু প্রাচীন পুঁথির নিদর্শন রয়েছে। কয়েকটি বৈষ্ণবীয় পুঁথি যেমন - জন্মাষ্টমী, ভাগবত কবচ, চৈতন্যচরিত, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি গ্রন্থ পাওয়া যায়। রাজবংশী সঙ্গীতেও বৈষ্ণবীয় প্রভাব রয়েছে।

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে রাজবংশী মানুষের বিশেষ অভ্যাস ও রীতি-নীতির। সেইসঙ্গে মেয়েদের কাপড় পরার ধরন এবং গহনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাজ-বংশী মানুষের খাওয়া খাদ্য এবং দৈনন্দিন কাজকর্মের বর্ণনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীর মানুষ সাধারণ বাঙালী খাবার খায়। তবে এদের কিছু বিশেষ খাবারও আছে।

বাড়িঘর নির্মাণে রাজবংশী সমাজে বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয় না তবে বাড়ির দুটি ভাগ থাকে। বাইরের ভাগকে বলা হয় থলতো বাড়ি অথবা আইগদো বাড়ি। ভেতরের অংশটুকু হয় থাকবার ঘর, রান্নাঘর ইত্যাদি। প্রতি বাড়িতেই ডারিঘর অথবা বসবার ঘর রয়েছে।

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে রাজবংশী রমণীর শরীরের গড়ন সম্পর্কে। মেয়েদের শরীরের গড়ন অত্যন্ত ভাল। মেয়েরা কালো ও ফর্সা দুই-ই হয়। পুরুষ ও মেয়েদের শরীরের গড়নের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল। (পার্শ্বস্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মেয়েরাই সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে। বাড়ির সংলগ্ন বাগান মেয়েরাই করে এবং পুরুষদের কাজে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে সম্পন্ন পরিবারের মেয়েরা এতে অংশ নেয় না। বাড়ির গবাদি পশু অর্থাৎ গরু মহিষ ছাগল ইত্যাদি মেয়েরাই প্রতিপালন করে।

রাজবংশী সমাজব্যবস্থা প্রাচীনপন্থী, খানিকটা আদিমতার ছোঁয়া রয়েছে। গ্রামের মানুষ যৌথভাবে কাজ করে যেমন - মাছধরা, শিকার করা ইত্যাদি। সুখে ও দুঃখে গ্রাম বাসীরা সকলে একত্রিত হয়।

এই অধ্যায়ে বিবাহ সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। নিজগোষ্ঠীর মধ্যেই বিবাহ হয়ে থাকে। সেই সঙ্গে বিধবা বিবাহের বিভিন্নরূপ আলোচনা করা হয়েছে। যেমন ফুল বিয়া, ছত্রদানী বিয়া, গাওগচু বিয়া ইত্যাদি। বিবাহ ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ বৈদিক মতে পরিচালিত হয়। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবশ্য বিবাহ সামান্য কারণেই ভেঙ্গে যায়। বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে পুরুষরা মেয়েদের কোনরকম ভরণপোষনের ভার নেয় না।

রাজবংশীরা খুবই ধার্মিক হয়। সমাজে বিভিন্ন ধরণের পূজার প্রচলন রয়েছে। প্রায় সকলেই পূজা আর্চা করে থাকে। ব্রতকথা পূজাতে মেয়েরা এক বিশেষ ঢঙে পরিবেশন

করে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মেয়েরাই মুখে মুখে গান রচনা করে প্রত্যুৎপন্নমতি এবং কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকে। মেয়েরাই সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় রাজবংশী লোকগীতির পারিপার্শ্বিকতা, বিষয়বস্তু ও সুরবৈশিষ্ট্য। লোকগীতির পারিপার্শ্বিকতা আলোচনা প্রসঙ্গে বলবার চেষ্টা হয়েছে কোন পরিবেশে গানগুলি রচিত হয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই এসে যায় নদীগুলির বর্ণনা। রাজবংশী লোকসঙ্গীত বেশির ভাগ গড়ে উঠেছে নদীকে কেন্দ্র করে। উত্তরবঙ্গে বেশ কয়টি নদী যথা তিস্তা, তোর্ষা, কালচিনী, জলঢাকা, বালাসন, মহানন্দা, সানিয়াজান, চেনাকাটা, সন্ন্যাসী কাটা ইত্যাদি। প্রতিটি নদীর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এর মধ্যে তিস্তা ও তোর্ষা নদীর ধরন এক। দুই নদীই চঞ্চলা হরিণীর মত উদভ্রান্ত। চৈত্র বৈশাখে কোথাও ক্ষীণস্রোতা, আবার কোথাও চরা পড়ে। মানুষের জীবন নতুন করে গড়ে ওঠে চরাতে, আবার বর্ষাতে এর রূপ সর্বনাশা নষ্ট যুবতীর মত। চরাতে জলের ঢল নামে। মানুষ ছুটে যায় উপরে। দুর্দশার শেষ সীমায় পৌছে মানুষের অবস্থা। তবু এ নদীর পাড়ে পাড়ে গান ছড়ান। রাজবংশী লোকসঙ্গীত বেশির ভাগ রচিত হয়েছে এই নদীকে কেন্দ্র করে।

কখনও বা ভিনদেশী নৌকার নাবিকের নৌকো ভাসতে দেখে নায়িকা পাগলিনী হয়ে গান বাঁধে। এই নদীগুলির পাড়ে পাড়ে রাজবংশী রমণীর প্রাণপুরুষ মইষাল মইষ চড়ায়। গাড়িয়াল গাড়ি চালিয়ে দূর দেশে যায়। মাহুত চলে যায় গহন অরণ্যে হাতি ধরতে। চলতে চলতে এদের জীবনে প্রেম আসে। বিরহিনী নায়িকা প্রাণ পুরুষের জন্য পাগল হয়। তাই রাজবংশী গানে নদীর একটা মুখ্য ভূমিকা রয়েছে।

লোকসঙ্গীতগুলি উপভোগ্য হয়ে ওঠে এর সুর বৈশিষ্ট্যে। গানগুলি বিশেষ ঢঙে গাওয়া হয়। নিজস্ব রাগভঙ্গীতে এবং সুরমাধুর্য্যে এ গান লাবণ্যমন্ডিত হয়ে ওঠে। গোটা উত্তরবাংলার সমাজচিত্র, শৃঙ্গাররস, প্রেম নারীর বিরহ ব্যাকুলতা, আর্তি, আশা, আকাঙ্ক্ষা, পতিপ্রেম, পরকীয়া প্রেমে পরিপূর্ণ গানগুলো সুরবৈশিষ্ট্যে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। এই গানকে

আকর্ষণীয় করে তুলেছে বিশেষ বাদ্যযন্ত্র। দোতরা, বাঁশী, সারিন্দা ছাড়া এ গান অসম্পূর্ণ। ভাওইয়াইয়া গানের বিশিষ্টতা পরিলক্ষিত হয় এর ভাঙ্গনে। সাধারণতঃ কাহারবা, দাদরা, ঝাপতালে এ গান গাওয়া হয়। বিবাহের গানগুলিরও বিভিন্ন রকম সুর রয়েছে। মৈষাল বন্ধুর গানের সময় মৈষালের চলার দুলকি ছন্দের সঙ্গে ভাঙ্গনের প্রয়োগ হয়। আবার খর-স্রোতা নদীতে নৌকা চালানোর সময়েও এক প্রকার, গলাভাঙ্গার প্রয়োগ দেখা যায়। ভাঙ্গনের রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে গায়কের অসমান চলার ছন্দে। যেমন - ছোটহো দাদা ইত্যাদি। গান-গুলি আঞ্চলিক ভাষাতেই গাওয়া হয়।

ভাওয়াইয়া গানের আর এক দিক চটকা। দ্রুত লঘু চটুল ছন্দে গাওয়া হয় বলে একে চটকা বলা হয়। চটুল ছন্দে হাস্যরসকে পরিবেশন করা হয়। সারিন্দা, বাঁশী, ঘুঙুর যন্দিরায় গানগুলি অনবদ্য রূপ পায়। ভাওয়াইয়া গানকে বলা হয় প্রেমের গান। আর চটকা গানকে বলা হয় রঙ তামাশার গান।

রাজবংশী লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে শুরুতেই বলতে হয় ব্রতকথাগুলির কথা। ফসল কামনায় এবং সংসারের সার্বিক কামনায় মেয়েরা ব্রত করে। মোট ছয়টি বহুল প্রচলিত ব্রতকথা রয়েছে যথা - হুদুমদ্যাও পূজা, ষাইটোল পূজা, কাত্তিপূজা, সুবচনী পূজা, ধরমঠাকুরের পূজা, ষাটপূজা ইত্যাদি। ব্রতকথাগুলো একান্তভাবে মেয়েদের নিজস্ব। পুরুষের কোন স্থান নেই এগুলিতে। ব্রতকথাগুলো পর্যালোচনা করলেই মেয়েদের মনের ধর্মনিষ্ঠা এবং একাগ্রতার পরিচয় পাওয়া যায়। কাহিনীধর্মী গীতিধর্মী ব্রতকথাগুলি এককথায় অনবদ্য।

বিবাহের গানগুলি অপূর্ব। লোকসঙ্গীতের ভান্ডারকে পরিপূর্ণতা দিয়েছে বিবাহের গানগুলি। এইগুলি বেশির ভাগ নারী দ্বারা সৃষ্ট।

টিস্তাবুড়ি গান, চোরচুরনীর গান, মেচেনী খেলার গানগুলি লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। অপূর্ব এর প্রকাশভঙ্গী এছাড়াও নানা পূজা যথা - ভান্ডানী পূজা, দেবীপূজা, কালীপূজা উপলক্ষে যে গান বাধা হয় তা অপূর্ণ। মেয়েরাই এতে অংশগ্রহণ করে থাকে। সমাজে নানা উৎসব হয় এবং সে উপলক্ষে গান বাধা হয় যথা - বিরুয়া গান, উদাসী গান, ভাগের গান, পাগলাপীরের গান, বারমাসীয়া গান, সোনারামের গান, গমীরা-ঠাকুরের গান। সব গানগুলিই খুবই শ্রুতিমধুর। দেহতত্ত্ব ও মনোশিক্ষার গানও রাজবংশী লোকসঙ্গীতের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে রাজবংশী সমাজে নারীর স্থান এবং লোকগীতিতে তার প্রতিফলন। সে প্রসঙ্গে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে সংসারে মেয়েদের ভূমিকা। নারী পুরুষের ছত্রছায়ায় থেকেও সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি যথা নানা ব্রতকথা, পূজা আর্চা করে থাকে। বিবাহ থেকে শুরু করে সমাজের সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এই অধ্যায়ে দেখান হয়েছে রাজবংশী সমাজে পিছিয়ে পড়া জনসমাজ। তুলনায় মেয়েরা আরও অশিক্ষিত। অথচ এই সমাজের মেয়েরা বিশেষ গুণে গুণান্বিতা। তা সত্ত্বেও মেয়েরা পায় না তাদের যথা-যোগ্য মূল্য। নারী পুরুষের হাতের পুতুলমাত্র।

এই সমাজের মেয়েরা ভীষণ কষ্টসহিষ্ণু। কখনও প্রেম দিয়ে প্রেমাস্পদকে অথবা স্বামীকে ভোলায় কখনও অপার ভালবাসা দিয়ে। সতীন-পুত্রকেও লালন করে। এও দেখা গেছে দুশ্চরিত্র মদ্যপ স্বামীকে ভাল করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে। প্রাসঙ্গিক ভাবে বলা হয়েছে এই সমাজের মেয়েরা পর্দানসীন নয়।

এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে রাজবংশী রমণীর সারাদিনের দিনলিপি। সারাদিন তারা নানা কাজে ব্যস্ত থাকে। বাড়ির সংলগ্ন বাগান করে এবং আশেপাশের জঙ্গল থেকে জ্বালানির কাঠ নিজেরাই সংগ্রহ করে।

আলোচ্য অধ্যায়ে বিধবা বিবাহের বিভিন্ন রূপ দেখান হয়েছে। বিবাহ সহজেই হয় অথচ ঢেমনি, গাওগছ, পাচুয়া, পরফেত্রী পাচুয়া ইত্যাদি নানা ধরনের বিধবা বিবাহ রয়েছে। বিধবার বিবাহের পর মেয়েরা কতটা সামাজিক সম্মান পায় তা বিশদভাবে দেখান হয়েছে।

আলোচনা করা হয়েছে বিধবাদের সন্তানেরা সংসারে কতটা মূল্য পাবে অথবা স্বীকৃতি পাবে। এই অধ্যায়ে সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে নারী পরিবারের সম্পদ অথচ সে পায়না। প্রকৃত মূল্য। পঞ্চানন বর্মার 'ডাং ধরিযাও' কবিতা দুটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চানন বর্মা মেয়েদের হীন অবস্থা দেখে তাদের 'অসি' ধরতে বলেছেন। 'ডাং ধরি' কথার অর্থ লাঠি বা অসিধারিনী। নারীর সতীত্ব রক্ষার্থেই পঞ্চানন বর্মা অসি ধরতে উপদেশ দিয়েছেন।

বারমাসী সঙ্গীত ও মেয়েলি গীতে বিভিন্ন লেখকের মন্তব্য প্রসঙ্গে মেয়েদের সৃজনী শক্তির আলোচনা করা হয়েছে। ভাওয়াইয়া গানে নারীর ভালবাসার বিভিন্ন দিক দেখান হয়েছে। চটকা গানেও নানা সামাজিক চিত্রের মাধ্যমে নারীর স্থান আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে বলা হয়েছে নারীর নানা গুণ থাকা সত্তেও সে প্রকৃত মূল্য পায় না। নারী শুধুই পুরুষের হাতের পণ্যদ্রব্য। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী এখানে নিগৃহীতা, অবহেলিতা, নিপীড়িতা।

পুরুষশাসিত সমাজে থেকেও নারীরা তাদের স্নেহ, দয়া, মায়া, ভালবাসা, কৌতুক, হাসি ও গানে সংসারকে ভরে রাখে। গানে গানে ব্যক্ত হয়েছে নারীরই জয়গান। সংসার জীবনে নারী কখনও স্বামীর মন জয় করছে কখনও পরকীয়া প্রেমে আসক্ত স্বামীকে ভাল করছে। ভয়ঙ্কর রাগী স্বামীকেও ভালবাসায় ভরিয়ে তুলতেও দেখা যায়। বিশেষতঃ ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীত একচ্ছত্র প্রেমের জয়গান। নারীর প্রেমের অপার মহিমাকীর্ত্তনই ভাওয়াইয়া সঙ্গীত।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন বিবাহ, নানা ব্রতকথা, পূজা আর্চ্চা ইত্যাদিতে নারী-জীবনের একটা পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায়। ধর্মনিষ্ঠার দিক ছাড়াও কৌতূকপ্রিয়তা এদের জীবনের সঙ্গে জড়ান। তারই প্রতিফলন দেখা যায় নানা রঙ তামাশার গানে।

পঞ্চম অধ্যায়ে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নারীদের সঙ্গে রাজবংশী নারীর তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। লোককথা বা লোকগাঁথা সর্বকালে এবং সর্বযুগে এক। তফাৎ যা কিছু রয়েছে তা হল ভাষা ও সুরে। সব সমাজেই নারীকুল লোককথার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকে। সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে নারী সমাজই বাঁচিয়ে রাখে। সেদিক থেকে অন্যান্য অঞ্চলের নারীদের সঙ্গে রাজবংশীয় নারীর তফাৎ কিছু নেই। বিভিন্ন রকম ধাঁধা ছড়া, প্রবাদবাক্য, পূজা, ব্রতকথা, সারিগান, ফসলকাটার গান, জাগের গান দক্ষিণবঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গে এক। সবেতেই নারীকুলই অংশ গ্রহণ করে থাকে। উত্তরবঙ্গে যেমন সাইটোল, সুবচনী, ধরমঠাকুর, ষাটপূজা, হুদুমদ্যাও পূজা, কাত্তিপূজা, পুণ্যিপুকুর ব্রত, অলক্ষ্মী ব্রত, ইতুপূজা, তুষতুষলীব্রত, মাঘমণ্ডল ব্রত, গোফুর ব্রত, বনদুর্গার ব্রত, পাঁচড়া পূজা, মঙ্গলচণ্ডী ব্রত ইত্যাদি। সব অঞ্চলেই ব্রতকথাগুলির মধ্যে অদ্ভুত সাযুজ্য দেখে মনে হতে পারে দুই নারীর মনের কথা এক। তাদের চাওয়া পাওয়াও এক। যেমন উত্তরবঙ্গের হুদুম-দ্যাও ব্রত আর দক্ষিণবঙ্গের ভাদুব্রতর মধ্যে তফাৎ কিছু নেই। উভয়ব্রতই ফসল কামনার ব্রতকথা। বাঁকুড়া অঞ্চলেও তেমনি টুসু বা তোষলা ব্রত ফসল কামনায় মেয়েরা করে থাকে। উত্তরবঙ্গের মেয়েরা করে সুবচনী ব্রত আর দক্ষিণ বাংলার রাঢ় অঞ্চলের মেয়েরা করে মঙ্গলচণ্ডী ব্রত। উত্তরবঙ্গের ধরম ঠাকুর আর দক্ষিণবঙ্গের মাঘ মণ্ডল ব্রত কথার মধ্যে পার্থক্য নেই।

দক্ষিণ বাংলায় মেয়েরা স্বামী কামনায় করে - কুমারীব্রত, শিবপূজা, অশথ নারায়ণের ব্রত, পুণিপুকুর ব্রত। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী মেয়েরা করে অথাইপথাই পূজা, কাত্তি-পূজা, মেচেনীখেলা পূজা, বাঁশখেলা পূজা, ডিস্তাবুড়ি পূজা, চোরচুরনির গান ইত্যাদি।

ব্রতকথা পূজা আর্চা সব অঞ্চলেই এক। কিন্তু উত্তরবঙ্গের মেয়েদের পূজার ধরনে খনিকটা স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এখানে মেয়েরা একাত্ম হয়ে যায় দেবতার সঙ্গে। দেবতাকে মাটির আসনে বসায়। মাটির মানুষের সঙ্গে সংযোজন ঘটায়। দেবতা হয়ে পৃথিবীর মানুষ।

পল্লীরমণীদের বারমাসের কথা প্রায় সব অঞ্চলেই এক। স্থানভেদে কালভেদে তফাৎ কিছু নেই। যা কিছু পার্থক্য ভাষা ও সুরে। বৈশাখ থেকে চৈত্র মাস পর্যন্ত সব অঞ্চলেই নারীরা যেন একই সুরে কথা বলে। বিচ্ছেদীগানগুলো যেমন সদ্য বিধবার খেদ, বিদেশী স্বামীর জন্য দুঃখ সব অঞ্চলেই সমান। বিবাহ উপলক্ষে যে গান বাধা হয় তাতে সব অঞ্চলের মেয়েরা বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পল্লীবালারা গানে গানে ভরিয়ে তোলে বিবাহ আসরকে। গানগুলিও অত্যন্ত শ্রুতি-সুখকর।

সব অঞ্চলের সংস্কৃতি কৃষ্টি রক্ষার্থে নারীর ভূমিকা অসামান্য। সব অঞ্চলের রমণীদের সমান কৃতিত্ব। কিন্তু এক জায়গায় উত্তরবঙ্গের রমণীর স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যায় তা হল রাজবংশীয় রমণীর অতুলনীয় প্রেমের দক্ষতা। নারীর ভালবাসার অপার মহিমা ব্যক্ত হয়েছে গানে গানে। অন্তর উজাড় করা প্রাণঢালা সে ভালবাসা। প্রেমাস্পদর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। ভাওয়াইয়া সঙ্গীতকে এক কথায় রাজবংশী রমণীর প্রেমদলিল বলা যায়। নারীর প্রেমের এমন বিচিত্ররূপ আর কোন অঞ্চলের গানে ধরা পড়েনি। তাইতো রাজবংশী রমণী বিশেষ স্বাতন্ত্র্যে মহিমান্বিত।

পরবর্তী পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে এই অধ্যায়গুলি অবলম্বনে আমার আলোচনাকে উপস্থাপিত করতে চেষ্টা করব।

সূত্রনির্দেশ

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য - বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪, পৃ·৪১৪

২। বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকা, গ্রন্থমন্দির প্রকাশন, ১৯৯২, পৃ·১৭

৩। Census of India 1951, Vol. VI, West Bengal, Sikkim and Chandernagar, Part II Tables, The Tribes and Cartes of West Bengal.

- Census of India 1961 State primary census abstract, Vol. XVI : West Bengal and Sikkim, Part II - A General population.

- Vol. XVI : West Bengal and Sikkim Part V - A(1) Tables on Scheduled Castes.

- Vol., XVI : Tables West Bengal and Sikkim, Part V-A(11), Tables on Scheduled tribes.

- Vol XVI : West Bengal and Sikkim, Part II C(i) Social and Cultural tables.

- Census of India, 1971, Series 22, West Bengal Part-11-A : General population Tables.

- Series 22, West Bengal, part V -A, Special Tables on Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

- Series 22, West Bengal, part 11 C(11) Social and Cultural Tables.

৪। বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়া ও চটকা, গ্রন্থমন্দির প্রকাশন ১৯৯২, পৃ.১৭

৫। স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন - লিঙ্গুয়িস্টিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া, পৃ.১৫৩

৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য্য : বাংলার লোকসাহিত্য ১ম খন্ড, ক্যালকাটা বুক হাউস, ১৯৫৪, পৃ.৫৬

৭। নির্মলচন্দ্র চৌধুরী : বঙ্গ রমণীর বিস্মৃত ইতিহাস, মণীষা গ্রন্থালয়, ১৩৯৫, পৃ.৮

৮। Census of India, 1971, Series 22, West Bengal part-II- - A General population Tables.

- Series 22, West Bengal, part V - A Special Tables on Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

- Series, West Bengal, part 11 C(II) Social and Cultural Tables.

৯। Charu Chandra Sanyal : The Rajbansis of North Bengal : The Asiatic Society, Calcutta : 1965. p.9.

১০। Rajat Subhra Mukhopadhyay : The Rajbansis of North Bengal; A comparative Demographic profile : Department of Socialogy and Social Anthropology, University of North Bengal, Darjeeling, West Bengal 1990, page - 29.

১১। Rajat Subhra Mukhopadhyay, প্রাগুক্ত, পৃ. 34.

১২। নির্মলেন্দু ভৌমিক, প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকগীতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭, পৃ.১৭১